সংবাদ ৭২

তারিখ ... ১৫।১২।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৫ ...

# হিসেবের

068

জাগরী

একটি পত্রের সূত্র ধরে আজও কথা বলতে হচ্ছে। পত্রটি সংবাদ পত্রিকায় দশই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। 'জনৈক সহকারী অধ্যাপক' মাত্র এই পরিচয়ে এই পত্রলেখক জানিয়েছেন—বাংলাদেশের সকল শিক্ষাবোর্ডে পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক প্রদানে গড়িমসি করার প্রবণতা রয়েছে। এতে করে সীমিত আয়ের শিক্ষকদের পড়তে হয় যথেষ্ট দুর্ভোগের আবর্তে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও এমন একটি চিঠি পাওয়া গেছে গত পনেরোই নভেম্বর তারিখে —যার প্রেক্ষিতে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে 'সংবাদ' পত্রিকায় ষোলই নভেম্বরে।

এমন পত্রকে 'অভিযোগ' বলে চিহ্নিত করা বোধহয় অসমীচীন। কিছুটা যেন নির্দয়তাও। প্রাপ্য সময় মতোন না পাওয়ার যে যন্ত্রণা, তা প্রকাশের জন্য যখন পত্রিকার দ্বারস্থ হতে হয় বুঝতে হয় সে প্রকাশের চেহারা 'অভিযোগ' নয়। অন্তরের 'আর্তি' তখন 'আর্জি' হয়ে দাঁড়ায়—সমাজ নামের বিশাল পটভূমে যা 'অভিব্যক্তিতে' রূপ নেয়। অভিযোগের কাঠিন্য নিরুপায়তার মালিন্যে বিলীন হয়ে যায়, অশ্রুসজল অবরুদ্ধ আবেগ হাজারো হৃদয় সিক্ত করে সংশ্লিষ্টদের হৃদয়তট স্পর্শ করার পথ পায়।

সে যাক। পত্রের রেশ ধরে এগুলে দেখা যায়, পত্র রচনাকারী কল্পনার আশ্রয়ী নন। এমনকি নন অতিরঞ্জনেরও। বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাগুলোর খাতা মূল্যায়িত করার বিনিময়ে সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা বিদ্যমান। মূল্যায়নের শ্রমের সঙ্গে সে প্রাপ্তির সামঞ্জস্য কতোটুকু, সে প্রশ্ন এ মুহূর্তে থাক। প্রায় প্রতিবছর পরীক্ষার ফিস বাড়ানো হলেও পরীক্ষকদের রেট বাড়েনা কেন—সেও মনে হয় নাজুক প্রসঙ্গ। যেটুকু দেয়ার কথা, এখন শুধু তারই হিসেব হোক। বিচার্য হাক আজ শুধু হিসেবের পাওনাটাই।

না, সত্যি সত্যি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়িত হয়ে গেলে কাছাকাছি কোনও সময়ে বিল পরিশোধের রেওয়াজ নেই। এমনকি পরীক্ষার ফলাফল প্রদানের পরেও এ নিয়ে হুড়োতাড়ার রীতি নেই। চেক হাতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে অনেক সময় গড়িয়ে যায়। এজন্য পরীক্ষকদের অনেক অনেক প্রত্যাশার চৌকাঠ পার হতে হয়। এর জন্য যে অসুবিধা হয়, তা কেবল প্রত্যাশার অবমাননা বা প্রতীক্ষার মৃত্যু নয়। বাস্তবিকই এজন্য দুঃসময় মোকাবেলা করতে হয়।

একেকজন পরীক্ষককে কর্মস্থলের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে পকেটের পয়সা খরচ করে 'মিটিং'-এ হাজির হতে হয়। পয়সা ও ধকল যুগপৎ ব্যয় করে খাতা বয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং একইভাবে দেখা খাতা প্রধান পরীক্ষকের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। দূরান্তের পরীক্ষকদের উত্তরপত্র বিশেষ ব্যবস্থায় ডাকযোগে পাঠাতে হয়। খাতার সংখ্যার গরমিলে (যে দায় বোর্ডের), টপসীট ও প্যাকেটের মধ্যের ক্রমিক নম্বরের গোলমালে (যে দায় কেন্দ্রের) প্রশ্নপত্রের নম্বর বিভ্রমে (যে দায় প্রশ্নকর্তার) পরীক্ষককে দৌড়ুতে হয় প্রধান পরীক্ষকের কাছে সমাধানের আশায়। সমাধান হয়েই যায়, কিন্তু মূল সংকট হচ্ছে এ জন্য গচ্চা যায়। সময়, এনার্জি, কড়ি—সবই তালগোল পাকিয়ে বেচারার জন্য শিরঃপীড়ায় পরিণত হয়। সবসময় এমন বিভ্রান্তি হয় না। এমন বিপুল কলেবরের কাজে এমন বিচ্যুতি অস্বাভাবিকও না, কিন্তু যখন এমন কিছু হয়, তখন পুরো দায়টাই পড়ে পরীক্ষকের মাথায়।

মূল্যায়িত খাতা মূল্যায়নের হেরফেরে এবং তা জমা দেয়ার বিলম্বে হুঁশিয়ারি, কৈফিয়ত, বিল-কাটা, মান কমিয়ে দেয়া— এমনি নানা ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা পরীক্ষকের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং তা সঙ্গতও। তাই পরীক্ষক হিসেবে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা সাময়িক হলেও কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তেমন কর্তব্য সুসম্পন্ন করে তার জন্য ন্যায্য প্রাপ্তিটুকু সময়মতোন পাওয়ার আশা নিশ্চয়ই করা যায়। অষ্টপ্রহর অতন্দ্র প্রহরীর মতোন সমস্ত থেকে, দৈনন্দিন কাজ শেষে রাত জেগে বাড়তি শ্রম করে যে খাতা দেখা, তার মূলে পেশাগত নিষ্ঠা ও মানসিক ভালো লাগা থাকে অবশ্যই, কিন্তু সে সঙ্গে শ্রমের মূল্যটাও মন চায়, এ স্বীকারেও কুণ্ঠা নেই। ধৈর্যের বাঁধ শেষে যে পাওয়াটা সময় হারিয়ে হাতে আসে, তখন প্রাপ্তির তৃপ্তিটুকু যায় সর্বতোভাবে নিঃশেষ হয়ে। চেক প্রাপ্তির অহেতুক বিলম্ব, শুধু মনোকষ্ট ছাড়াও বাস্তব হয়রানির কারণ হয়ে ওঠে। চেক কবে মিলবে এমন অনুসন্ধানেও নগদ পয়সা গচ্চা দিতে হয়। বিজ্ঞানের ও মানবিক বিভাগে ব্যবহারিক আছে এমন বিষয়ে যারা 'এক্সটার্নাল' নিযুক্ত হন, তাদের টি, এ, ডি, এ বহনের দায়িত্ব তাদের নিজেদের। সেসব ক্ষেত্রেও পাওনা হাতে আসে সুদীর্ঘ দিন গোনার পর।

কেবল পরীক্ষক নয়, একই সত্য কোশ্চেন সেটার, স্ক্রুটিনিয়র, টেবুলেটর, মার্কসীট রাইটার, সকলের বেলায়। কেবল শিক্ষাবোর্ড নয়, একই তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়েও। কোনও বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই। তড়িঘড়ি নগদ কাজ আদায়—প্রাপ্তি বাকীর খাতায়।

অবশ্য কেবল বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে ঠুকে লাভ কি, এমন কাণ্ড কোথায় না নেই? মানানসই বিলম্বে টাকা মেলে কোন্ কাজে? ব্যবসা-বাণিজ্যের মতোন মূল খরচের টাকা ধারণের ক্ষমতা না থাকলে এবং অনির্ধারিত বিলম্বের ভার বহনের সাধ্য না থাকলে কোন ক্ষেত্রেই উপায় নেই। কিন্তু তাই বা কি করে হয়—ব্যবসার ক্ষেত্রেও তো লগ্নি অনির্দিষ্ট অনিশ্চয়তার খপ্পরে নয়!

যাঁরা পরীক্ষাসমূহের খাতা দেখার কাজ পান, তাঁরা পেশায় টিচার। সাধারণতঃ অন্য পেশাধারীর এ দায়িত্ব পাওয়ার কথা নয়, পানও না বোধহয়। সীমিত আয়ের একজন শিক্ষক এই বাড়তি উপার্জনের জন্য পরম আগ্রহী হন। অবশেষে প্রয়াসী। খাতা মূল্যায়িত করার সুযোগ তাঁকে দান করে একদিকে, যৎসামান্য হলেও, মর্যাদা, অন্যদিকে অর্থ, যদিও যৎসামান্য তাও। এ প্রচেষ্টায় সফল হতে একেকজনকে শোনা যায় অনেক কষ্ট করতে হয় ক্ষেত্রবিশেষে অবমাননা সওয়ার সে কথা শোনা যায়, তাও নাকি মিথ্যে নয়। কিন্তু প্রশ্ন তাও নয়। আপনা থেকেই কাজ কোথাও হয়না। মেধা, আপনা-আপনিই পুরস্কৃত হয়না—যদিও তাই হওয়ার কথা! এই না হওয়াটা কোনও এক ক্ষেত্রেই নয়, সর্বত্রই। এই না-হতে পারাটা সকল অনুন্নত দেশেই। পাওয়ার পথ মসৃণ করতে হয় কৌশলে—প্রাপ্তির দরোজা উন্মুক্ত হয় ঘিয়ে-তেলে। দেশ-কাল ভেদে নিয়ম যখন এই, বিচিত্র কি স্বল্প আয়ের শিক্ষককুলের বরাতে জুটবে এক ও অভিন্ন ধারাই।

এ পর্যন্ত তাই অফসোস থাকলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সংশ্লিষ্ট

সংবাদ ৭২

তারিখ ... ১৫।১২।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৫ ...

# পাওনা

টিচারদের বেদনার ভার লাঘব হবে কি দিয়ে? নগদ এনে নগদ খাওয়ার মানুষ তাঁরা। তিরিশ দিনে তাঁদের মাসোহারা সব সময় জোটে না। এ দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকের প্রাপ্তি মাসশেষে নিশ্চিত নয়। কয়েক মাস পর পর কিস্তিতে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়া হয় অথবা মাসশেষে প্রাপ্তির ছিটে-ফোঁটা দেয়া হয়। পত্রিকার পাতায় পাতায় এমন সংবাদ হামেশাই পাওয়া যায়। কাজেই এসব অলীক গাঁথা নয়। সেই শিক্ষকেরাই যখন ধারদেনা করে পথ খরচা সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র সংগ্রহে ব্রতী হন এবং উত্তরপত্রের মোড়কগুলো এমনভাবে সংরক্ষণ করেন যেন তা অতি মূল্যবান ধন, তখন বুঝতে হয়— কেন তাদের এর জন্য এমন মমতা, এমন আকর্ষণ। এই খাতাগুলো যেন তাঁদের কাছে দর্পণ। এর মধ্যে তাঁরা চাকরিজীবনের কৃতিত্ব ও সচ্ছলতার প্রতিফলন অবলোকন করতে চান। অথচ সেখানেও ছন্দপতন। এখানেও তাঁরা বিপর্যস্ত হন। প্রাপ্তি সময়মতোন না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হন। সব শেষে জন-আদালতে হাজির হন।

শিক্ষক সম্প্রদায় কেন, সীমিত আয় বলতে যা বোঝায় তা অনেক সম্প্রদায়েরই। বেসরকারী চাকরির তিনদশা, তার কাহিনী অর্থহীন। প্রায় চর্বিত চর্বনের সমান। কিন্তু সরকারী চাকরিতে? সেখানে পরিষ্কার চাকরির স্তর আছে? নির্দিষ্টতা সেখানেও। কিন্তু তা যতো উঁচুস্তর, ততো পার্শ্ব-সুবিধা। দেশজুড়ে কতো কতো ফ্ল্যাট তৈরী হয়েছে, হচ্ছে এবং হয় কিন্তু তার কোনটাই সাধারণদের জন্য নয়। যদিও বা থাকে কোথাও, প্রতিযোগিতার পাল্লায় সাধ্য কি তাতে হাত পৌঁছায়? একেকজন চাকুরেকে শহর থেকে শহরাঞ্চলে চরকির মতোন যেতে হয়, ঘুরতে হয় রোদে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে। বছরের মাঝখানে বদলি হয়ে সন্তানের ভর্তি ও শিক্ষা নিয়ে অকূল সাগরে পড়তে হয়। সেই চাকরির মেয়াদও একদিন শেষ হয়। জীবনভর কাজ করেন যে পেনসনের আশায়, অবশেষে সে পেনসনকেই অবলম্বনের নিক্তি করতে হয়। কিন্তু তাঁরও তো একই প্রশ্ন। কোথায় পেনসনের ঝাঁপি। পাবেন অবশ্যই। পাওয়ার নিশ্চয়তাটুকু আছেই। চাকরি-কর্মজীবনে যাঁরা তাঁর জুনিয়র ছিলেন, অবসর গ্রহণ করে অনুকম্পা ভিক্ষা করতে হয় তাঁদের কাছেই। লাঠি, চশমা, ন্যুব্জ দেহ নিয়ে কর্মব্যস্ত কর্মজীবীদের কাছে গিয়ে আবেদন জানাতে হয়, 'আমার ফাইলটি না ছাড়লে আমার যে কষ্ট হয়।' কর্ণিৎকর্মা স্বজন বা শুভানুধ্যায়ী না থাকলে সহসা জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচিত হতে পারে না। সময়ের সিঁড়ি এখানেও অতিক্রম করতে হয়।

তত্ত্বে চিঁড়ে ভেজে না। পেটও ভরে না। উদর এমনি এক গহ্বর—এর জন্য অপমান-অভিমান বোধ থাকলে চলে না। এজন্য নির্লাজ না হয়ে উপায় নেই। পত্রিকার পাতায় পাতায় আবেদন না জানালেই নয়, 'আমি চাই।' 'আমার চাই'। এ চাওয়া কখনও বিল, কখনও ভাতা, কখনও পেনসন, কখনও গ্রাচুয়িটি। এমনকি ধরনা দিতে হয় প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অর্থের জন্যও। একইভাবে চাইতে হয় ইনসুরেন্স-এর ম্যাচিওর হওয়া টাকা, দীর্ঘ দিনের বকেয়া-বেতন, ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিশ্রুত ঋণ, বিনিয়োগের মূলধন, মনিঅর্ডারের নিরুদ্দিষ্ট অঙ্ক।

এই যে সব চাওয়া, তা প্রাপ্তব্য পাওয়ার জন্যই। যা পাওয়ার কথা, শুধু তা-ই কালবিলম্ব না করে পেয়ে যাওয়া। বাঘের চোখ নয়, নয় হরিণের মস্তক অথবা গুইসাপের চামড়া কিংবা দাঁত হাতীর। তবু কেন যেন প্রাপ্তিও হয়ে ওঠে অনিশ্চিত, অলীক।

প্রাপ্তি পাওয়ার জন্য এমনসব প্রার্থনা আর সব আবেদনের চেয়ে আলাদা। সড়ক বা সেতু নির্মাণ, পোষ্টাফিস বা বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের সঙ্গে এর মিল নেই—সম্পর্ক নেই নতুন করে মঞ্জুরির সঙ্গে অথবা চাকরির সুবিধা লাভের ব্যাপারে। শ্রমের বিনিময়ে লভ্যাটাই চাই—তাই স্বাভাবিকভাবেই দাক্ষিণ্যের বা দয়ার প্রশ্নটি এখানে নেই।

তবু কেন যেন করুণার প্রশ্ন ওঠে। উঠছে। প্রাপ্তব্য পেতে চাওয়া যেন কৃপা প্রার্থনা। সময়মতোন পাওয়ার প্রত্যাশাটি যেন দুরাশা। অথচ এমন হওয়ার কথা না। কথা না কারণ এমন জটিলতার কথা লেখা নেই কোনও বিধানে। যে বিধান বলে—কাজ শেষে টাকা মিলবে। আমাদের জানা মতে, এই প্রদানের নিয়ম-কানুন সহজ করা হচ্ছে। তবু কেন মেঘ জমে উঠবে? এই জিজ্ঞাসাটি প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে।